অশোককুমার রায়

বিদ্যাসাগরের ও বাঙালির *বর্ণপরিচয়*

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*, ১ম ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল। আধুনিককালের শিক্ষাচিন্তার সার্বিক প্রয়াসে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে দেড়শ বছর অতিক্রান্ত উপরিউক্ত ঘটনাটির গুরুত্ব সীমাহীন একথা সহজেই অনুভব করা যায়। বাংলা গদ্যের জনক রাজা রামমোহন রায় (১৮৭২-১৮৩৩) এবং তাঁর পরবর্তীকালে বাংলা গদ্য সাহিত্যের যথার্থ নির্মাতা ও সার্থক প্রয়োগ শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁদের বাল্যকালে এরকম কোনো আদর্শ প্রাথমিক পুস্তিকা পাঠ করবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বা বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) (১৮৬৩-১৯০২) হাতে খড়ির সময় থেকে বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*-এতে সিদ্ধাচার্যগণ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলির পদকর্তাগণ বা মঙ্গলকাব্যের কবিগণ নিশ্চয়ই তালপাতার পাতায় লেখা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয় লাভ করেছিলেন। তখন ঐ পুঁথিগুলিই ছিল বাল্যশিক্ষার তথা সর্বজনের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান সহায়। ফলে বিভিন্ন লিপিকরের নানা ছাঁদের হস্তলিপির বৈচিত্র্য এবং বাংলা বানানের অসামঞ্জস্য একদিকে যেমন এ ভাষার ঐতিহ্যকে করেছে বিড়ম্বিত। তেমনি উত্তরাধিকারসূত্রে নির্দিষ্ট এ ভাষার ভবিতব্যকে করেছে বিভ্রান্ত। সেই বিড়ম্বনা ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে বিদ্যাসাগরের মৌলিক ভাবনা তথা প্রয়াসের ফসল *বর্ণপরিচয়*, ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ, *বোধোদয়*, *কথামালা*-র নাম নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

সংস্কৃত পণ্ডিতের হাতে যথোচিত সংস্কার সহ *বর্ণপরিচয়* ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বাহন রূপে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ছাপাখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাগ্দেবীর বাহন হংস দিগ্বিদিকে উড়তে আরম্ভ করলো তালপাতার পুঁথির সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে। রামমোহনের কাল থেকে ছাপাখানার মাধ্যমে শিক্ষা জগতের সকলেই এই যুগান্তকারী মুদ্রণ যন্ত্রের আনুকূল্য পেয়েছেন। বলা বাহুল্য হলেও বার বার বলা ভালো, নবজাগরণের সেই নব বসন্তে *বর্ণপরিচয়*-এর ডানায় ভর করে ফুলের আগুন ছড়িয়ে গিয়েছিল পূর্বভারতের নীল দিগন্তে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই কথার সূত্রে জেনে রাখা ভালো, একমাত্র সরস্বতীর বাহন হংসই যেতে পারে—জল, স্থল ও অন্তরিক্ষে। অখণ্ড বাংলার জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে বিদ্যাদেবীর বিজয়বৈজয়ন্ত—*বর্ণপরিচয়*। বিদ্যাদেবীর বহুবর্ণরঞ্জিত নিশান।

বেদ বাইবেল বা কোরাণ নয়। *মেঘনাদ বধ* কাব্য, *আনন্দমঠ* উপন্যাস বা *গীতাঞ্জলি* কাব্য নয়। আপাত তুচ্ছ *বর্ণপরিচয়*-এর দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হলেও উনিশ-বিশ শতকের আনন্দ-শিহরন একুশ শতকেও রোমাঞ্চিত করছে আজও, কি প্রাসঙ্গিকতায় কি প্রাথমিক শিক্ষার উদ্বোধনে অপরিহার্য গ্রন্থ রূপে। বসন্তকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়'। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে আবির্ভূত আর একটি বালক-বীর

বর্ণপরিচয়-এর প্রতিও অনুরূপ উক্তি অনায়াসেই করা যায়। তার প্রধান কারণ পরাধীন দেশের নিরক্ষর জনগণের কাছে এই শীর্ণকায় পুস্তিকাটি ছিল সর্ববিধ বন্ধন মুক্তির হাতিয়ার; শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় *বর্ণপরিচয়*-এর বহু সংস্করণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩) অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি—"তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। যে দিন পড়িতেছি 'জল পড়ে, পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।" জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ও *রবীন্দ্র জীবনী* প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠ্য পুস্তক 'বর্ণপরিচয়'—উহার সাহায্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সহিত ভাবী কবির প্রথম পরিচয় ঘটে।" 'রিসিভার সংস্করণে "জল পড়ে", "হাত নাড়ে", পাওয়া যায়, কিন্তু পাতা নড়ে না। বর্তমানে বর্ণপরিচয়ের অষ্টম পাঠে পাওয়া যায় "জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে, ফল ঝুলিতেছে"। কোথাও 'জল পড়ে, পাতা নড়ে নেই'। বর্ণপরিচয়ের তৎকালীন সংস্করণে ছিল কিনা জানি না।

১৮৫৫-তে বাংলাদেশে সাক্ষরতার শতকরা হার কত ছিল জানি না; ১৯৫৫-তে শতকরা তিরিশ ছিল, তাহলে একশো বছর আগে কত থাকতে পারে সহজেই অনুমেয়। সে সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাই ছিল গ্রামবাংলার উচ্চশিক্ষা। সেই নামমাত্র শিক্ষাও ছিল অবহেলিত। বিদ্যাসাগর সঙ্কল্প গ্রহণ করেন শিক্ষাবিস্তারের, বিশেষ করে নারী শিক্ষা বিস্তারের। অশিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর সেই সংগ্রামের হাতিয়ার হল—এই *বর্ণপরিচয়*।

শুরু থেকে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকায় শিশুপাঠ্য উপযোগী গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় রেভারেন্ড জেমস লঙ্ (১৮১৪-১৮৮৭) প্রণীত *A Descriptive Catalogue of Bengali Books and Pamphlets* (১৮৫৫)-এ তাতে ১৮১৬ থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের ও পুস্তকের নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ থাকলেও শিশু শিক্ষার প্রাথমিক গ্রন্থ তখনও পর্যন্ত রচিত হয়নি।

সেই সময়কার বিশিষ্ট পণ্ডিত ও কবি মদনমোহন তর্কালংকার (১৮১৭-১৮৫৮) বাংলা ভাষায় প্রথম শিশুদের শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ *শিশু শিক্ষা* (১৮৪৯) রচনার মধ্যে দিয়ে ছন্দবদ্ধ ভাবে পর্যায়ক্রমে ১ম ভাগ, ২য় ভাগ ও ৩য় ভাগ পাঠের মধ্যে শিশুমনের অন্ধকার দূরীভূত করেন। মদনমোহন ছন্দের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন—যেমন

'ঝড় বয় বড় ভয়। যত কয় তত নয়।'

এখানে কবি সচেতন ভাবেই ছন্দবৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্যমিলের এক নিবিড় গভীর অন্বয় সাধন করেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠকালেই মদনমোহনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের গভীর বন্ধুত্ব জন্মে। শুধুই বন্ধুত্ব নয় তাঁরা সমমনস্ক ও সমভাবাপন্ন ছিলেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা নারী শিক্ষা বিস্তারে উভয়ের কৃচ্ছ্রসাধন, লাঞ্ছনা ও প্রয়াস আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বিদ্যাসাগর শিশু চিত্তের প্রণতা, মানসিক চাহিদা ও শিশু শিক্ষা বিষয়ক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লেখকদের গল্প, নীতিকথা, উপদেশ কাহিনি, রূপকথা—প্রভৃতি গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। যেমন—*The Children's Picture Fables Book*, জে. ওয়াকারের *The Handy*

Book of Object Lessons Loke-এর *The Principles of Education* ইত্যাদি। এইভাবে দেখা যায় ঈশ্বরচন্দ্র পৃথিবীর নানা দেশের শিশু-মনোবিজ্ঞান, প্রাথমিক বা বুনিয়াদি শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন এবং যার প্রয়োগ তাঁর রচিত। সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বিচিত্র পাঠ্যপুস্তকে। শিশু মনের সার্বিক উন্নতিকল্পে বাংলা বর্ণমালাকে আরও সহজ সরল ও প্রাঞ্জল করে গড়ে তোলেন তিনি এই *বর্ণপরিচয়* ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ গ্রন্থে।

বর্ণপরিচয়-এ ছন্দের স্থান নেই, অন্তত বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ অবলম্বনে মুদ্রিত বর্তমানের *বর্ণপরিচয়* গ্রন্থটিতে। মদনমোহনের *শিশু শিক্ষা*-র সঙ্গে *বর্ণপরিচয়*-এর মূলগত পার্থক্য। এ প্রসঙ্গে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬)-এর মত হল—শিশু শিক্ষায় ছন্দগত মিল আছে, তথ্যগত মিল নেই। আর *বর্ণপরিচয়*-তে তথ্য ঠিক আছে, ছন্দ বা মিল নেই। তা ছাড়া আলোর দিশারি বিদ্যাসাগর *বর্ণপরিচয়*-এর মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালার সংস্কার সাধন করেন। *শিশু শিক্ষা বর্ণপরিচয়*-এর পূর্বে রচিত হওয়ায় পূর্বের বর্ণমালা অনুযায়ী ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল।

বিপ্লব। সংস্কৃত ভাষার বাঁধন থেকে বাংলাভাষার ক্রমমুক্তির প্রাথমিক পর্বেই বিপ্লব। কোনো দল নেই, সমিতি নেই, কোনো সভা-সমাবেশ নেই—দাবিদাওয়ার কোন মিটিং মিছিল নেই; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একক চিন্তায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত—বাংলা বর্ণমালা সংস্কার। এলো বাংলা বর্ণমালায় 'সৃষ্টি', 'স্থিতি', 'প্রলয়'। সৃষ্টি হল 'ড়' 'ঢ়' এবং 'য়'। অনুস্বর (ং) ও বিসর্গ (ঃ)—এর আগে ছিল স্বরবর্ণের সামিল। সব দিক বিবেচনা করে তিনি ওই আশ্রিত বর্ণদুটিকে ব্যঞ্জনবর্ণের মর্যাদা দিয়ে চিরস্থায়ী স্থিতি ঘটালেন। তার সঙ্গে আরও দুটি বর্ণের আমদানি করে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন, খণ্ড 'ত' (ৎ) এবং চন্দ্র বিন্দু (ঁ)। আর প্রলয় ঘটালেন দীর্ঘ (ৠ) ও দীর্ঘ (ৡ) বর্ণদুটির বিলোপ ঘটিয়ে। এ কাজ যে তখনকার দিনে কত কঠিন ছিল, তা বুঝতে পারা যায় একথা চিন্তা করলেই যে, স্বয়ং বিদ্যাসাগর পথিকৃৎ হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট অপ্রয়োজনীয় '৯' কার টিকে বিদায় জানাতে পরবর্তীকালের ভাষা সংস্কারকদের আরও দেড়শ বছর লেগে গেল। এই বাবদ আরও অনেক কাজ বাকি। উচ্চারণ অনুযায়ী 'ঋ' ব্যঞ্জনবর্ণ রূপে মেনে নেওয়া। তিন 'স', দুই 'ন', দুই 'ই', দুই 'উ' এবং 'খণ্ডত' সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে আসা; তদ্ভব শব্দগুলিকে সম্পূর্ণরূপে 'ষত্ব'-'নত্ব'-র বন্ধন মুক্তি করা প্রভৃতি অনেক সমস্যা আছে—এগুলির সমাধান যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। 'ক' ও 'ষ' মিলে 'ক্ষ' হয়, সুতরাং সংযুক্ত বর্ণ, এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনায় ধরা হয়নি। তাই বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়-এর ১ম ভাগের ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন) লিখলেন—*বর্ণপরিচয়*-এর প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। এর আগে বহুকাল অবধি, ষোল স্বরবর্ণ ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল।

বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করলেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণসমূহের গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বাংলা ভাষাকে মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। বাংলা গদ্যকে আরও সাবলীলভাবে গড়ে তুলতে তাঁর উদ্যমের অন্ত ছিল না। তাঁর ভাষা রীতি সহজ সরল সর্বোপরি সুখপাঠ্য। *বর্ণপরিচয়*-এর ভাষা শিশুভাষার মতই ধ্বনিময়। কবিগুরুর ভাষায় বলি—'মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে।' (*বিচিত্রা*, পৃষ্ঠা ১৫০)

তাই বিদ্যাসাগর শিশু শিক্ষার প্রয়োজনে শিশু উপযোগী শিশু ভাষা নির্মাণ করলেন সৃষ্টির আনন্দে, তাকে মার্জিত করে নানা বর্ণে ঋদ্ধ করলেন ভাষার সৌন্দর্যে। এ পদ্ধতি ভাষাতত্ত্বের নিয়মে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই। তাই *বর্ণপরিচয়*-তে অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি স্বরবর্ণের পাশাপাশি অন্য বর্ণ সহযোগে সৃষ্টি হল শব্দ যেমন—অ + জ = অজ, আ + ম = আম ইত্যাদি। একইভাবে 'ি', 'ী', 'ু', 'ূ', কার ইত্যাদি তারপর দুই অক্ষরে মিশ্র—'চাবি', তিন অক্ষরে মিশ্র—'বিকার' প্রভৃতি।

শিশু বর্ণপরিচয়-এর জন্মলগ্ন থেকে দেড়শত বর্ষ অতিক্রম করলেও উত্তর আধুনিক যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।